The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVI, 2020 (pp. 117 - 134)
Published in November 2024

বৌদ্ধ দর্শনের কার্য-কারণ-তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা: একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শাসনানন্দ বড়ুয়া রুপন *

[সারসংক্ষেপ: গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিলো খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে। তিনি ছয় বছর কঠোর সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধত্ব বা পরম জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি এ জ্ঞান অধিগত হয়ে আবিষ্কার করেছিলেন কার্যকারণতত্ত্ব। দর্শনের ইতিহাসে এটি একটি বৌদ্ধ দার্শনিক মতবাদ হিসেবে বিবেচিত। বৌদ্ধ দর্শন প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্য-কারণ-নীতি তত্ত্বে বিশ্বাসী। জীবন ও জগতে হেতু বা কারণ এবং কার্য একই সূত্রে গ্রথিত। কারণ ব্যতীত কোনো কার্য সংঘটিত হয় না। কারণের ওপর নির্ভর করে কার্য সংঘটিত হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে এ কার্য-কারণতত্ত্ব উপলব্ধি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুঃখ নিবৃত্তিই হলো বৌদ্ধ দর্শনের মূলমন্ত্র। কারণ বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম মূলনীতি আর্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদ দার্শনিকতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। গৌতম বুদ্ধ এ নিয়মের ওপর ভিত্তি করে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের অবসান এবং দুঃখ বিনাশের উপায়তত্ত্ব প্রকাশ করেন। এ প্রবন্ধে বৌদ্ধ কার্য-কারণতত্ত্বেরর স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা, দুঃখ মুক্তি, বিশ্বশান্তি, কার্যকারণতত্ত্ব উপলব্ধির গুরুত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।]

আলোচ্য প্রবন্ধটি বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে করা হয়েছে। তথ্য উপাত্তগুলোতে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস অনুসৃত হয়েছে। প্রাথমিক উপাত্তগুলি পালি ও বাংলা ভাষায় লেখা। তবে সকল গ্রন্থের বাংলা ও ইংরেজি অনুবাদ রয়েছে। এছাড়া দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব একটি সহজবোধ্য বিষয় নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক লেখক, গবেষক বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের প্রতীত্যসমুৎপাদের সমর্থনে যুক্তিসম্মত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, ড. সুকোমল চৌধুরী, ভিক্ষু নাগসেন ও গ্রীকরাজ মিলিন্দের কথোপকথন, ড. বহ্নি কুমারী চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকের নাম উল্লেখযোগ্য।

বিষয়সূচক শব্দ (Key Word): অজ্ঞানতা, ভবচক্র, কার্যকারণতত্ত্ব, বিশ্বশান্তি, দুঃখমুক্তি।

ভূমিকা

কার্যকারণতত্ত্ব বৌদ্ধ দর্শনে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ কার্যকারণতত্ত্ব দর্শন জগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কার্যকারণ নিয়মের অর্থ হলো সকল কার্য কারণ থেকে উদ্ভূত হয়। প্রত্যেক কার্যের একটি সুনির্দিষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। কারণ কার্যের পূববর্তী ঘটনা। সুতরাং প্রথমটি কারণ দ্বিতীয়টি হলো কার্য। কিভাবে জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম হয় তার একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে কার্যকারণনীতিতত্ত্বে। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব বলতে কার্যকারণনীতিকে বোঝায়। এখানে দ্বাদশ কারণ বিদ্যমান রয়েছে। দুঃখের পশ্চাতে এ দ্বাদশ নিদানের প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। এ দ্বাদশ নিদানের প্রথমটি হলো অবিদ্যা। এ অবিদ্যা সত্যকে জানতে দেয় না। অবিদ্যাই হলো সকল দুঃখের আদি বা মূল। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন দ্বারা অবিদ্যার অবসান ঘটাতে পারলেই কেবল

* সহযোগী অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

সকল দুঃখের অন্তঃসাধন সম্ভব হয়। তাই বলা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শন দুঃখমুক্তি ও শাশ্বত শান্তির দর্শন। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধই মানুষকে অনাসক্ত জীবন গঠন, দুঃখের চির নিবৃত্তিতে সহায়তা করতে পারে। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধের অভাবে মানুষ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। কার্যকারতত্ত্ববোধের অভাবে অনন্ত দুঃখ সাগরে পতিত হতে হয়। এ বোধ জাগ্রত হলে মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে। বুদ্ধের সকল আলোচনাই জীবনকেন্দ্রিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের আধার হলো প্রতীত্যসমূৎপাদ।

বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের অর্থ

প্রতীত্যসমুৎপাদ বলতে কার্যকারণনীতিকে বোঝায়। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' কথাটির অর্থ কোনো কিছুকে প্রাপ্ত হয়ে বা অবলম্বন করে কার্যের উদ্ভবকে (On getting the cause, the effect arise) বোঝায়। (সেনগুপ্ত ৯৫)। আবার অভিমুখে গমন করে বলে হেতু-সমুহ প্রতীত্য নামে এবং সহযোগী ধর্মকে উৎপন্ন করে বলে 'সমুৎপাদ' নামে অভিহিত হয়। অবলম্বনকে ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয় বলে 'প্রতীত্য' এবং উৎপন্ন হওয়ার সময় সমবায়ে এবং সম্যকরূপে উৎপন্ন হয় অথচ একক নয়, হেতু ব্যতীত নয় বলে 'সমুৎপাদ' বলা হয় (শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু, ১৪৯)। দীর্ঘনিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে অধীত্য সমুৎপাদকে দার্শনিক মতবাদরূপে বর্ণিত হয়েছে। তার মূল কথা হলো: আমি পূর্বে ছিলাম না, পূর্বে না হয়ে এখন আমি সত্ত্বে পরিণতি হয়েছি (রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের, শীলভদ্র ৩১,৩২)। 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' বলতে একটি সুশৃংখল চিন্তা প্রণালী হিসেবে বৌদ্ধধর্ম-দর্শনের মূলনীতিকে বোঝায়। বোধিসত্ত্ব শান্তির পথ অন্বেষণে বের হয়ে গভীর, দুর্দশ, দুরনুবোধ্য, শান্ত, প্রণীত, তর্কাতীত, নিপুণ ও পণ্ডিতবেদ্য ধর্মের এ দুই তত্ত্ব আয়ত্ত্ব করেছিলেন। সেগুলো হলো- ১. প্রতীত্য সমুৎপাদ, ২.সর্ব তৃষ্ণামুক্ত বিরাগ ও নির্বাণ (শ্রী বেনীমাধব বড়ুয়া ১৭৫-১৯০)। গৌতম বুদ্ধ বলেন:

> "বিজ্ঞান প্রতীত্য-সমুৎপাদ, কারণ ব্যতীত বিজ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। কারণবশতঃ উৎপন্ন হয় (পচ্চযং পটিচ্চ উপ্পজ্জতি) অর্থেই প্রতীত্যসমুৎপাদ" (বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী ১)।

বিশিষ্ট বৌদ্ধ গবেষকরা হল সাংকৃত্যায়ন বলেন:

> *"প্রতীত্য সমুৎপাদে কার্যকারণকে অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। বিনাশ ও সৃজন একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। একেই বুদ্ধ বলেছেন প্রতীত্য সমুৎপাদ। প্রতীত্য সমুৎপাদের বিচ্ছিন্ন প্রবাহকে মূলসূত্র রূপে ধরে নিয়ে পরবর্তী কালের দার্শনিক নাগার্জুন শূণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন* (ভট্টাচার্য ২০২০, ১৪)।"

গৌতম বুদ্ধ দীর্ঘ ছয় বছর কঠোর তপস্যার মাধ্যমে যে ফল অর্জন করলেন তা প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণনীতি নামে অভিহিত। মানুষের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড; দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতির সাথে এক অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র রয়েছে। প্রাত্যহিক জীবনেও এর প্রভাব রয়েছে। কার্যকারণতত্ত্ব অনুধাবন করতে পারলে মানুষের গুণগত আচরণের মানদণ্ড উন্নত হতে পারে। মানুষ দুঃখ মুক্তির সাধনায় অগ্রসর হতে সক্ষম হবে। মনুষ্যত্বের বিকাশ ত্বরান্বিত হতে পারে। সুশীল ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণ সহজতর হতে পারে। মানুষ নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শনে মানবতা সতত প্রকাশমান। তাই মানবতা, বিশ্বশান্তি, দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য এ কার্যকারণ নীতির নিবিড় যোগসূত্রের কথা স্বীকার করা অপরিহার্য। বিশেষ করে অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটন করা গেলে প্রজ্ঞা উৎপন্ন হবে। প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত মানুষ মানবিক হতে বাধ্য। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। দুঃখ মুক্তির সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। এ

জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয়। এ বিশ্বে বিনা কারণে বা আকস্মিকভাবে কিছু সংঘঠিত হয় না। প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার কারণ রয়েছে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্য-স্বীকার্য 'কার্য-কারণ' নিয়মে চলে। এ 'কার্য-কারণ' নিয়ম জগতে স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করে চলছে। সকল সংস্কার অনিত্য। অনিত্য মাত্রই দুঃখ, যা দুঃখ তা অনাত্মা। একমাত্র শান্ত নির্বাণই হলো পরমার্থ স্বরূপ (সেন ১৪২)। উপর্যুক্ত কারণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনিত্য অর্থ হলো যা নিত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর নয় অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী। এখানে পরিবর্তনশীলতাকে অনিত্য হিসাবে বোঝানো হয়েছে। যা ক্ষণিক, ক্ষণভঙ্গুর, তা দুঃখময়। এ ক্ষণিকত্ববাদ বা ক্ষণ-ভঙ্গবাদ প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুসিদ্ধান্ত। কারণের ওপর নির্ভর করে বস্তুর আর্বিভাব ঘটে বলা অর্থ ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করা। এ কারণ ধ্বংস হলে বস্তুটি তিরোহিত হয়। যা উৎপন্ন হয়; তার ধ্বংস অনিবার্য। যা ধ্বংস বা মৃত্যুর অধীন তা শাশ্বত নয়। যা স্থায়ী নয়; তা ক্ষণিক (সরকার ৭৫। উপর্যুক্ত কারণে প্রতীত্য সমুৎপাদ অনুধাবন করে জীবন ক্ষণস্থায়ী এ বোধ জাগ্রত করে মানবীয় গুণাবলির বিকাশ করা করা যায়। তা সম্ভব হলে সকল দুঃখের অন্তঃসাধন করা যাবে। বৌদ্ধ দর্শনে কার্য-কারণতত্ত্বের স্বরূপ ও এর প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ নিম্নরূপ:

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের শ্রেণীবিন্যাস

বৌদ্ধ সাহিত্য তথা ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূত্রপিটকের মধ্যম নিকায়ের অন্তর্গত ক্ষুদ্র সকুলোদায়ী সূত্রে বুদ্ধ সকুলোদায়ী পরিভ্রাজকের উদ্দেশ্যে বলেন: উদায়ী! রেখে দাও পূর্বান্ত (পূর্বকোটি) চিন্তা, রেখে দাও অপরান্ত (অপরকোটি) চিন্তা (শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির ১৭০)। যখন এটিকে শুধু দুঃখ সমুদয়ের হেতু নির্ণয়ার্থে তুলে ধরা হয়। তখন এটিকে উৎপত্তির আলোকে বা 'অনুলোম' দেশনা হিসেবে অভিহিত করা হয়। যখন এটিকে দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তখন এটি নিবৃত্তি বা 'পটিলোম' দেশনা হিসেবে অভিহিত। আবার যখন এটিকে দুঃখ সমুদয় ও নিরোধ উভয়ের হেতু নির্ণয়ে উপস্থাপন করা হয়। তখন এটিকে উৎপত্তি-নিবৃত্তিবশে বা 'অনুলোম-প্রতিলোম' দেশনা হিসেবে দেখানো হয়। খুদ্দক নিকায়ের উদান গ্রন্থে রয়েছে: "অনুলোম দেশনা" বা সাধারণ ধারাবাহিকতায় কার্য-কারণ-শৃংখলগুলিকে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ উপায়াসা পর্যন্ত চিন্তার বিষয় হিসেবে উল্লেখ করা হয়। প্রতিলোম দেশনা বা বিপরীত পর্যায়ে সূত্রটি যথাক্রমে অন্ত থেকে আদি পর্যন্ত অর্থাৎ উপায়াসা থেকে আরম্ভ করে পুনরায় অবিদ্যা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়। গৌতম বুদ্ধ জন্ম-মৃত্যুর রহস্য আবিষ্কার করেন। আবার এক সপ্তাহব্যাপী ধ্যানরত হয়ে প্রতীত্য সমুৎপাদের অনুলোম-প্রতিলোম (উদয়-বিলয়) ভাবনা করেন। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে: দ্বাদশ নিদানকে দুঃখের কারণ হিসেবে যথার্থরূপে জানতে হবে। এ দুঃখের কারণগুলি ধ্বংস করতে পারলেই সকল দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ করা সম্ভব হয়। এটিই হলো প্রতীত্য সমুৎপাদের মূলসূত্র (রনধীর বড়ুয়া ১৯)। প্রতীত্য-সমুৎপাদের দ্বারা সংসারের বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্টের দূরীভূত কারণগুলি দেখানো হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে যে, দুঃখের এ মূলীভূত কারণগুলি নিঃশেষে ধ্বংস করা গেলে ভবিষ্যতে আর দুঃখের উৎপত্তি হবে না। অন্য কথায় এর দ্বারা চতুরার্য সত্যের দুঃখের কারণ সত্য ও দুঃখের অবসান সত্যের নির্দিষ্ট দার্শনিকতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এক কথায় এটিকে সর্বপ্রকার দুঃখ-উৎপত্তি তত্ত্ব ও দুঃখ-বিমুক্তি তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয় (সুদর্শন বড়ুয়া ১৭৬)। প্রতীত্যসমুৎপাদকে বুদ্ধ একটি সোপান শ্রেণির সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মে কার্যকারণ শৃংখলের বারটি কারণ রয়েছে। এ দ্বাদশ নিদানকে সংক্ষেপ করলে লোভ-দ্বেষ-মোহরূপে চিহ্নিত করা যায়। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনে এ দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রকে ত্রিকালে (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত)-এর মধ্যে ভাগ করা হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বারা আনুমানিক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের পরস্পর সম্পর্ক ও আপেক্ষিকতা দেখানো হয়েছে। পুনর্জন্মের কার্মিক হেতু (কারণ) মোট পাঁচটি। সেগুলো হলো: অতীত ভবের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান ও ভব, এই

পাঁচটি কার্মিক হেতুর ফলে বর্তমান জন্মে বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা এই পাঁচটি ফলের উৎপত্তি হয়। বর্তমানের অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা ইত্যাদি পাঁচটি কার্মিক হেতু আবার ভবিষ্যৎ জন্মে বিজ্ঞান, নাম-রূপ ইত্যাদি পাঁচটি ফল সৃষ্টি করবে। এ নিদান (ভবচক্র) ও প্রত্যয়ের পারস্পরিক সাপেক্ষ ক্রমের ওপরে ভিত্তি করে জগৎ সংসারে জীবের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়ে থাকে। অতএব এ অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য বা শাশ্বত বলে কিছু থাকতে পারে না। তখন কিছুতেই তাঁর আর আসক্তি বা তৃষ্ণা থাকে না। ফলে সকল দুঃখের অবসান সম্ভব হয়। শাশ্বত সুখ নির্বাণ লাভও সম্ভব হবে। নির্বাণ লাভই হলো বৌদ্ধ-দর্শনের সার সংক্ষেপ (ড. সুকোমল চৌধুরী ১০৯-১১১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণ অর্জন করা সম্ভব হলে আর ভব বা পুনর্জন্মের কোনো অবকাশ থাকে না। বুদ্ধ খুব সাবলীলভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাঁর এ দার্শনিক সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এরূপে মানুষ বৈষয়িক আকাঙ্ক্ষা থেকে, সুখভোগ থেকে বিরত হয়ে দুঃখ মুক্তি, শান্তিপূর্ণ, মানবিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ লাভ করবে।

প্রতীত্যসমুৎপাদের দার্শনিক তত্ত্ব

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের দার্শনিক গুরুত্ব খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে: উদ্ভিদ যেরূপ বীজের মাধ্যমে অপর উদ্ভিদের উৎপাদন করে; তেমনি মানুষের বর্তমান জীবনের সাথে পরবর্তী জীবনের একটা ধারাবাহিকতা বা সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। বিশিষ্ট দর্শন লেখক দেবব্রত দাশ বলেন: এর জন্য কোনও সর্বজ্ঞ, নিত্য চেতন কর্তার প্রয়োজন নেই। সুতরাং জগতের কারণরূপে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার প্রয়োজন পড়ে না (দাশ ১২১)। বর্তমান জন্মে কৃতকর্মের কারণে ফলস্বরূপ প্রাণী জগতের জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ সূচনা হচ্ছে। বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় আদি সৃষ্টি বলে কোনো কিছুই দেখা যায় না। এটিই প্রতীত্যসমুৎপাতত্ত্বের মৌলিক তাৎপর্য। বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের দুটি দিক আছে। একদিকে জন্ম হতে জন্মান্তরে মানুষ কীভাবে কার্যকারণ পরম্পরার প্রভাবে আবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে। অপরদিকে বিশ্ব বা সৃষ্টি তত্ত্বের ধারণা কীভাবে গড়ে উঠেছে তা বলা হয়েছে। জগৎ ও মানুষের প্রারম্ভের সম্পর্কে দীর্ঘ নিকায়ের 'অগগঞ্ঞ সূত্রে' বর্ণিত বিষয়ের সাথে বর্তমানকার বৈজ্ঞানিকদের 'বিবর্তন সূত্রের' সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। এ সূত্রে বুদ্ধ বলেন: "লোকের (পৃথিবীর) বিবর্তন হবার পর জগৎ জলময় ছিলো, তখন চারদিকে গভীর অন্ধকার, চাঁদ নেই, সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই, রাত-দিনের অস্তিত্ব নেই, মাস, পক্ষও প্রকট হয় না, ঋতুও না, বর্ষাও না, স্ত্রী-পুরুষও না (দীঘ নিকায়ের অগ্গঞ্ঞ সূত্র বিস্তারিত দ্রষ্টব্য) (শীলভদ্র ৪৮৮)। জগৎ চক্রের চলাকালে কীভাবে সৃষ্টির বিবর্তন ও দীর্ঘ পরিবর্তন হয় বুদ্ধ তা উল্লেখ করেছেন। তিনি **(বুদ্ধ)** আরও বলেছেন, ব্যক্তি জীবনের ন্যায় এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এবং জগৎ চক্রেরও উদয় হয়; আবার লয় (ধ্বংস) হয়। আমাদের পৃথিবীও একদিন ধ্বংস হবে। পূর্ববর্তী পৃথিবীরও তা হয়ে আসছিল এবং পুনরায় তা হবে। যে ভাবেই হোক না কেন তা সবই কার্যকারণ নিয়মের শৃংখলে গ্রথিত। সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রাণপ্রবাহের মূলে প্রতীত্য সমুৎপাদের দ্বাদশ নিদান বা ভবচক্রের কারণে প্রাণীর জন্ম-পুনর্জন্ম হয়ে আসছে (শীলভদ্র ১-২)। বৌদ্ধ দর্শনে রয়েছে:

"সমুদিত যবে ধর্ম, জ্ঞানের বিষয়,
বীর্যবান ধ্যানরত ব্রাহ্মণের হয়।
দূরে যায় সর্ব শংকা-সকল সংশয়,
জানে যাহে হেতুবশে ধর্মসমুদয়।"[১]

যদি এ হেতুটি থাকে, তাহলে এ ফলটি হয়। এটির সৃষ্টি হলে এটির সৃষ্টি হয়। হেতু বা কারণের উৎপত্তিতে ফলোৎপত্তি, হেতু নিরুদ্ধ হলে ফলের নিরোধ হয়। এরূপে দুঃখের উৎপত্তি ও দুঃখের নিরোধ হয় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর পরিসমাপ্তি । এ উদয় (সৃষ্টি)-বিলয়ের (বিনাশের) অন্তঃসাধনই হলো নিবৃত্তি বা নির্বাণ। বৌদ্ধধর্ম-দর্শন অনুসারে বিশ্বের যাবতীয় কিছুই শর্তাধীন। সব কিছুই কারণ সম্ভূত বা সাপেক্ষ। অকারণে কোনো কার্য সম্পাদিত হয় না। বুদ্ধের উদ্ভাবিত চতুরার্যসত্য ও অপরাপর দার্শনিক মতবাদ এ দার্শনিক তত্ত্বের উপরই প্রতিষ্টিত। এ দার্শনিক বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি দুঃখ উৎপত্তির জটিল বিষয়াদির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সমগ্র বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম আধার বা আশ্রয় বা মূল ভিত্তি। বস্তুত বৌদ্ধ দর্শন হৃদয়ঙ্গম করার এটি অন্যতম মাধ্যম। এ প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি বা কার্যকারণনীতিতত্ত্ব খুবই গম্ভীর এবং গম্ভীরতর। তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির ওপর খুবই গুরুত্বারোপ করেছিলেন। তিনি এটিকে ধর্ম হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রতীত্যসমুৎপাদে আরোহণ করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান অর্জন করে জগতের রহস্য অনুধাবন করা যায়। বুদ্ধের মতে, 'এ জগতের প্রতিটি জিনিস, দৈহিক বা মানসিক, অবশ্য স্বীকার্য কার্য-কারণ শৃংখলে আবদ্ধ। কোনো কিছুই বিনা কারণে বা আকস্মিভাবে ঘটে না বা উৎপন্ন হয় না।' এ জগতে কোনো বস্তু বা ঘটনা আত্মনির্ভর নয়। প্রতিটি বস্তু বা ঘটনার পেছনে কারণ থাকে। জাগতিক সকল বস্তুই এক সর্বব্যাপক ও অবশ্যস্বীকার্য 'কার্যকারণ' নিয়মের অধীন। বিজ্ঞানের একটি অবশ্য স্বীকার্য তত্ত্বের নাম কার্য-কারণ সম্পর্ক (causal relation)। এ কার্য-কারণ সম্পর্কের উপর এ তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত। এ কার্য-কারণ নিয়ম জগতে স্বতঃস্ফুর্তভাবে কাজ করে চলছে। প্রত্যেক কার্যেরই এক পূর্ববর্তী কারণ আছে। মানুষের বর্তমান জীবনের কারণ হলো তার অতীতের কৃতকর্ম। মানুষের বর্তমানের পরিণতি হলো ভবিষ্যত। মানুষকে স্বকৃত কর্মের ফলভোগ করতে হয়। কর্মফল অনুযায়ী মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। তবে আকাঙ্ক্ষামুক্ত, আসক্তিহীন ও মোহমুক্ত কর্মের মাধ্যমে নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি আর কোনো প্রকার অকুশল কর্ম সম্পাদন করেন না। (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ২৮)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম রোধ হয়। ফলে তাঁকে আর পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয় না।

দ্বাদশ নিদানের স্বরূপ ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

প্রতীত্যসমুৎপাদের বারটি অঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে। এতে দ্বাদশ সংযোজনের ভিত্তিতে গঠিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। উপর্যুক্ত কারণে প্রতীত্য সমুৎপাদতত্ত্ব সর্বপ্রকার দুঃখের কারন ও দুঃখ থেকে মুক্তির-উপায়তত্ত্ব হিসেবে অভিহিত। দ্বাদশ নিদানের স্বরূপ ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রদান করা হলো নিম্নে:

১.১ অবিজ্জা বা অবিদ্যা

অবিদ্যা হলো দুঃখের মূল কারণ। পালিতে অবিজ্জা যা বাংলায় অবিদ্যা। অবিদ্যাকে 'জ্ঞানের' বিপরীত অর্থে বুঝতে হবে। অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞানতা। কিন্তু কিসের অজ্ঞানতা? অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম এ ত্রিলক্ষণাত্মক জগতের স্বরূপ সম্যকরূপে উপলব্ধির অভাবই হলো অবিদ্যা। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধ বা জীব ও বস্তুর ধর্মসমূহ যে অস্থায়ী, ক্ষণস্থায়ী ও ক্ষয়ধর্মী হেতু এগুলো যে দুঃখময়, তা বুঝতে না পারাই হলো অবিদ্যা। দুঃখের মূলীভূত কারণ যে তৃষ্ণা, তা না বুঝতে না পারাই হলো অবিদ্যা। তৃষ্ণার বিনাশ করতে পারলে যে দুঃখের অবসান ঘটে, তা' জানা হলো অবিদ্যা। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যে দুঃখ নিরোধের উপায় তা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে না পারাটাই হলো অবিদ্যা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ধর্মসমূহ যে অসার ও অনাত্ম তা অনুধাবন করতে না পারাই হলো অবিদ্যা (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া, ২১)। মহামানব গৌতম বুদ্ধ বলেন:

> "হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যার অতীত সম্পর্কে এরূপে জানা যায় না যে, এ অবিদ্যা পূর্বে ছিলো না, এটা পরবর্তীতে উৎপন্ন হয়েছে। এ উক্তির প্রেক্ষাপটে বলা চলে যে, 'এটা প্রত্যয়েই অবিদ্যা" (ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী ১১১)।

দুঃখকে সুখ এবং অসারকে সার মনে করার নামই হলো অবিদ্যা। অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার ভেতরেই সকল অকুশল কর্ম ও অশান্তির মূল হেতু নিহিত রয়েছে। এ অবিদ্যাই সাংসারিক, সামাজিক, বৈশ্বিক নানা প্রকার দুঃখ, যন্ত্রণা, অশান্তি এবং লোভ, দ্বেষ, হিংসা, মান ও অভিমান ইত্যাদির কারণ। এ অবিদ্যার নিরোধে সেগুলির বিনাশ হয়। বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন দ্বারা অবিদ্যকে সমূলে উৎপাটন করতে সক্ষম হলে সংস্কারের নিরোধ হয় (কোসম্বী ৮৯)। আমিত্ব বোধই হচ্ছে বিশ্বে অশান্তির একটি অন্যতম কারণ। অবিদ্যাকে সমূলে উৎপাটন করতে পারলে আর কোনো আমিত্ববোধ থাকে না। ফলে অশান্তি অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায়। অবিদ্যার আদি অনির্ণেয়। তা সত্ত্বেও আমরা এর প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারি এবং এর প্রভাব হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারি। এ মহাসত্য বুদ্ধ বোধিদ্রুম মূলে বসে আবিষ্কার করেছিলেন, যা অত্যধিক কঠিন ও গম্ভীর; পরন্তু কার্য-কারণ শৃংখলাবদ্ধ (ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ২২২-২২৩)। অবিদ্যাজনিত আসক্তি বিনাশ হলেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় (শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের ৫৩)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে বুদ্ধ আদিতে এ অবিদ্যাকে স্থাপন করেন। এ অবিদ্যা চতুরার্য সত্য সম্পর্কে কিছুই জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না, দুঃখ মুক্তি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে দেয় না। এরূপ জানতে না দেয়াই হলো অবিদ্যার কার্য। সুতরাং অবিদ্যা চিত্তের এমন এক অজ্ঞানতা; যেই অজ্ঞানতা চিত্তকে উক্ত তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করতে করতে দেয় না (মুৎসুদ্দি ৩)। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, একমাত্র অর্হৎ চিত্তই অবিদ্যা, ক্লেশ এবং একমাত্র চ্যুতিচিত্তই প্রকৃত জীবিতেন্দ্রিয়কে ধ্বংস করতে সক্ষম (শীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির তাইওয়ান প্রিন্ট, ১৭০)। কিন্তু অবিদ্যামুক্ত ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, জীবন ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে জন্ম-মৃত্যুর অধীন থেকে মুক্ত হয়ে দুঃখ নিবৃত্তি করতে সক্ষম হয়। তারই আলোকে বলা যায়, অবিদ্যা হলো জন্ম-জন্মান্তরে চক্রের মূল কারণ। অবিদ্যাকে ভিত্তি করেই বিশ্বপ্রবাহের অনুভূতি (বন্দোপাধ্যায় ৩০, ৩১)। উপর্যুক্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, নির্বাণ প্রত্যাশী ব্যক্তি সর্ব প্রকার দুঃখ, সর্ব প্রকার আসক্তি হতে মুক্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে উন্নত চরিত্র গঠন করতে স্থিরচিত্ত হন। পুনর্জন্ম রোধ করে সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে মুক্তির জন্য, শাশ্বত সুখ ও বিমুক্তি (বন্ধন হতে মুক্তি) কামনা করেন। অপ্রাপ্ত নির্বাণ প্রত্যাশা করেন। এরূপ ব্যক্তি প্রথমে অবিদ্যার জাল ছিন্ন করে বিদ্যাসম্পন্ন হওয়ার চেষ্টা করে। কেননা, বিদ্যা বা প্রকৃত সত্য জ্ঞান অর্জনই দুঃখ মুক্তির সন্ধান দিতে পারে। জ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ সাধন করা সম্ভব হয় (শ্রী মহিমচন্দ্র বড়ুয়া ৮)। বিদ্যার (চতুরার্য সত্য জ্ঞান) সাথে শ্রদ্ধা (চিত্তের প্রসন্নতা), স্মৃতি (পুনঃ পুনঃ পুণ্যকর্ম স্মরণ) সমাধি (কুশল কর্মে একাগ্রতা), সংকল্প ও বীর্য (উদ্যমের সাথে দুঃখ মুক্তির প্রচেষ্টা বা সাধনা) দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ সাধন করা সম্ভব হয়। যে কোনো সাধক বিমুক্তি মার্গ অনুমোদনের পর শীল অনুশীলনে অপায় গমনের পথ রুদ্ধ করতে সক্ষম হন। সমাধি চর্চা করে তিনি কামলোকে উৎপত্তি রোধ করেন। প্রজ্ঞা লাভে তিনি সকল পুনর্জন্ম রোধ করেন। যদি সাধক পরিপূর্ণরূপে শীল পালন করেন এবং অল্প পরিমাণে সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলন করলে, তিনি স্রোতাপত্তিফল ও সকৃদাগামি ফল প্রাপ্ত হন। যদি সাধক শীল ও সমাধি পরিপূর্ণরূপে সাধনা করেন, তিনি অনাগামী ফল প্রাপ্ত হন। সাধক শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পরিপূর্ণরূপে অনুশীলন করেন। তিনি অর্হত্বের অনুপম বিমুক্তি সম্প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ বলেন: জগতের আদি সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ জগতের আদি চিন্তাতীত। এটি চিন্তা করলে সময় অপচয় হয়। ফলে তাকে পরে অনুশোচনা করতে হয়। (অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া ৩৮০, ৩৮১)। 'অবিদ্যা' জগতের আদি নয়; অবিদ্যা চির বিদ্যমান। বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত সুভদ্র ভিক্ষু বলেন:

"'অজ্ঞতা বা অবিদ্যার কারণে প্রকৃত সত্য জানা যায় না। যার ফলে দুঃখের মধ্যে পতিত হতে হয় এবং মুক্তি লাভ আর হয়ে উঠে না।'"(Vikkhu 68)

উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, অবিদ্যা ধ্বংস হলে প্রজ্ঞা উদয় হয়। প্রজ্ঞা মানুষকে আলোকিত মানুষে পরিণত করে। সুতরাং সর্ব অশান্তি, দুঃখের মূলে রয়েছে অবিদ্যা। এ অবিদ্যাকে অপসৃত করা সম্ভব হলে ইহ-জাগতিক, বৈশ্বিক ও পারমার্থিক, আধ্যাত্মিক সুখ, বিশ্বশান্তি, কল্যাণ, দুঃখ থেকে মুক্তি সহজ হবে। তাই সর্ব প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি প্রয়াসে জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় ভাস্বর হওয়া তাৎপর্যমণ্ডিত। সাধনার দ্বারা অবিদ্যা দূরীভূত করা গেলে সকল প্রকার দুঃখ, অশান্তি অপসৃত হয়ে যাবে।

১.২ সংস্কার

অবিদ্যার কারণে সংস্কারের সৃষ্টি হয়। সৎ ও অসৎ মনোবৃত্তিকে সংস্কার বলে। মানুষ ভালো চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে, আদর্শ কর্মের দ্বারা সৎ সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে। ভালো কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। তাহলে মানুষের পক্ষে দুঃখ থেকে পরিত্রাণ অর্জন করা সহজ হবে। সংস্কারের পালি অভিধা 'সংখার'। পালিতে এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন: সংস্কারের অন্য নাম কর্ম। প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ প্রবাহে সংস্কার মানে চেতনা। চেতনা ব্যতীত কর্ম সম্পাদিত হয় না। অতএব, প্রতি কর্মের মূলে রয়েছে কর্ম সম্পাদনের চেতনা বা সংস্কার। চিত্ত অবিদ্যা অবস্থায় যখন কোনো বিষয় চিন্তা করে, বাক্য বলে বা কার্য করে, তখন সেই চিন্তা, বাক্য বা কার্য চিত্তের এক নতুন ভাবের সৃষ্টি করে। চিত্তের এই নতুন ভাব বা অবস্থার নাম হলো 'সংস্কার'। চেতনাই ভালো-মন্দে পুঞ্জীভূত হয়ে সংস্কারে পরিণত হয়। আর তার অপর নাম হলো কর্ম। এ কর্ম পুনর্জন্ম উৎপাদক। এটিই 'অবিজ্জা পচ্চযা সংখারা'। অর্থাৎ অবিদ্যার কারণে সংস্কারের উৎপত্তি হয়। সংস্কারের উৎপত্তির পক্ষে অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় বা কারণ। কিন্তু একমাত্র হেতু নয়। এ বিষয়ে আরও বিভিন্ন প্রত্যয় সাহায্য করে থাকে। মানুষ যদি ভালো কর্মের মাধ্যমে, আদর্শ কর্মের দ্বারা সৎ সংস্কার সৃষ্টি করতে পারে, কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদনের অভ্যাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে মানুষের কোনো প্রকার অশান্তি, দুঃখ থাকবে না। কার্যকারণ নীতির দ্বাদশ অঙ্গের উৎপত্তি বহূ কারণের উপর নির্ভর করে। এখানে শুধু প্রধান প্রত্যয় বা কারণ, প্রকট প্রত্যয় বা অসাধারণ প্রত্যয় মাত্র উল্লেখিত হয়েছে (শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ৩, ৪)। সংস্কার পঞ্চস্কন্ধের একটি অন্যতম উপাদান। কিন্তু চার লোকোত্তর মার্গচিত্ত সংস্কার নয়। কারণ লোকোত্তর চিত্তগুলি অবিদ্যা ধ্বংসকারক। লোকোত্তর চিত্তে প্রজ্ঞার আধিপত্যই প্রধান এবং ইচ্ছাকৃত চেতনা লোকীয় চিত্ত সমূহে প্রাধান্য লাভ করে। অকুশল কর্মে অবিদ্যার প্রভাবই প্রধান। অবিদ্যার কারণে অকুশল কর্ম সম্পন্ন হয়ে থাকে (রঞ্জন বড়ুয়া ৩১০)। অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় হয়ে চিত্তে পুনর্জন্ম দায়ক তিন প্রকার সংস্কার (ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী ২২১)। উৎপন্ন করে থাকে। সেগুলো হলো: ১.পুণ্য সংস্কার ২.অপুণ্য সংস্কার এবং ৩.আনেঞ্জা সংস্কার। এগুলোর ব্যাখ্যা নিম্নরূপ:

- পুণ্য সংস্কার: অনেকে অবিদ্যার অপকারিতা চিন্তা করে তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন। অবিদ্যাকে ক্ষয় করার অভিপ্রায়ে দানাদি, কল্যাণমূলক কর্ম সম্পাদন করেন। তখন তাঁর সদাভ্যাস গঠিত হয় ও কুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়। দান, শীল, ভাবনায় রত হন। এরূপ কুশল কর্ম সম্পাদন করাই হলো পুণ্য সংস্কার। এরূপ কর্ম অনাবিলতার জন্য হয় সুন্দর, সুশোভন। এ জন্য তাকে বলা হয় কুশল বা পুণ্য কর্ম সংস্কার।

- অপুণ্য সংস্কার: অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে কোনো ব্যক্তি লোভ, দ্বেষ, মোহ চিত্তের দ্বারা চুরি, ব্যাভিচার, হত্যার মতো অকুশল কর্ম করে থাকে। এরূপ অকুশল কর্ম সম্পাদনের অভ্যাসকে অকুশল সংস্কার বলে। অপুণ্য চেতনা কাম-ক্রোধাদি অকুশল, পাপবিদ্ধ। অপুণ্য চেতনা প্রসূত কর্মকে বলা হয় অকুশল বা পাপকর্ম সংস্কার।

- আনেঞ্জা সংস্কার: ভাবনাদি দ্বারা উৎপন্ন চার প্রকার অরূপাবচর কুশল চেতনাই আনেঞ্জা সংস্কার। এখানে সূত্রপিটকের অন্তর্গত ধর্মপদের একটি শ্লোক প্রণিধানযোগ্য। যেমন:

সুখং যাব জরা সীলং সুখা সদ্ধা পতিট্ঠিতা,
সুখো পঞ্ঞায পটিলাভো পাপনং অকরণং সুখং (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ১১৯)।

অর্থাৎ, বার্ধক্য পর্যন্ত সচ্চরিত্র থাকা সুখকর, প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা সুখকর, প্রজ্ঞালাভ সুখপ্রদ এবং পাপাচরণ না করাই সুখকর। এখানে সুখ লাভের জন্যে পুণ্যকর্ম সম্পাদনের ওপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন উঠে যে, সংস্কার কেন হয়, কিসের কারণে সংস্কার? এর উত্তরে বলা যায় যে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা বা সত্যোপলব্ধির অভাবে সংস্কার উৎপন্ন হয় (ভট্টাচার্য ১৩)। এ সম্পর্কে বুদ্ধ এক সময় বলেন: তাঁর সভায় হয়ত এমন একজন শ্রমণ আছেন; যিনি ভাবছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তিনি হয়ত একটি পরাক্রান্ত রাজ পরিবারে জন্ম নেবেন। এ ভাবনাই পুনর্জন্মের সুখের আকাঙ্খা বা আকুতি। এটিকেই ভবচক্রের দ্বিতীয় নিদানে 'সংস্কার' বলে (দাশগুপ্ত ৯৩)। প্রতীত্য সমুৎপাদ বা কার্যকারণ প্রবাহে সংস্কার মানে চেতনা। সূত্র পিটকের অঙ্গুত্তর নিকায়ে রয়েছে: ''চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদামি''। অর্থাৎ, চেতনাই কর্ম নামে অভিহিত। বস্তুতঃ চেতনা কর্মে রূপান্তরিত হয়। সচেতন চেষ্টা ছাড়া কর্মের অনুষ্ঠান হয় না। অতএব প্রতি কর্মের মূলে রয়েছে কর্ম সম্পাদনের চেতনা। পুনরায় চেতনা লোভাদি হেতুযুক্ত হয়ে কর্মে পরিণত হয়। এ চেতনা সংস্কার রূপে চিত্ত সন্ততিতে সুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করে। সুযোগ পেলে এটা কায় ও বাক্য দ্বারে ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য বলা হয়, নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত চিত্ত সন্ততিতে এটি সুপ্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। যখন সুযোগ পায় তখনই ফল প্রদান করে (ড.রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া ৪৬১, ৪৬২)। এ সংস্কারের উৎপত্তি ও নিরোধ সম্পর্কে নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ৪৭) নিম্নরূপ:

মিলিন্দ : ভন্তে নাগসেন ! এমন কোনো সংস্কার আছে, যা উৎপন্ন হয় ? "নাগসেন : হ্যাঁ মহারাজ ! এমন কোনো সংস্কার আছে যা উৎপন্ন হয়।" মিলিন্দ : সেগুলি কি কি ? নাগসেন : মহারাজ ! চক্ষু-বিজ্ঞান হতে চক্ষু সংস্পর্শ হয়, চক্ষু সংস্পর্শ হতে বেদনা (অনুভূতি) হয়, বেদনা হতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হতে উপাদান হয়, উপাদান হতে ভব (কর্ম) হয়, ভব হতে জন্ম হয়, জন্ম হতে জরা-মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ-দুশ্চিন্তা-হতাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে কেবল এ দুঃখপুঞ্জের উৎপত্তি হয়। নাগসেন : মহারাজ ! চক্ষু ও রূপ না থাকলে চক্ষু-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, চক্ষুবিজ্ঞান না থাকলে চক্ষু সংস্পর্শ হয় না, চক্ষু সংস্পর্শ না থাকলে বেদনা উৎপন্ন হয় না, বেদনা উৎপন্ন না হলে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় না, তৃষ্ণা উৎপন্ন না হলে উপাদান উৎপন্ন হয় না, উপাদান উৎপন্ন না হলে ভব উৎপন্ন হয় না, ভব উৎপন্ন না হলে জন্ম হয় না, জন্ম না হলে জরা মরণ-শোক-পরিবেদন-দুঃখ দুশ্চিন্তা হতাশা উৎপন্ন হয় না, এ প্রকারে কেবল এই দুঃখপুঞ্জের সম্পূর্ণ নিরোধ হয়ে যায়।' মিলিন্দ : "ভন্তে নাগসেন ! আপনি দক্ষ।" বুদ্ধ ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে আনন্দকে বলেন:

"কোনো (সম্যক) দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি সংস্কারকে নিত্য বলে স্বীকার করতে পারে না। বরং যে কোনো পৃথগজন (সাধারণ মানুষ) সংস্কারকে সুখদায়ক বলে গ্রহণ করতে পারে" (শ্রী বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ৭৬)।

অবিদ্যা দূর করতে পারলে সংস্কার ধ্বংস হয় (সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, অবিদ্যাকে ধ্বংস করে সর্ব প্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারলে সর্ব প্রকার দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করা সম্ভব হয়।

১.৩ বিজ্ঞান

পালিতে বিঞ্ঞাণং,বাংলায় বিজ্ঞান এবং ইংরেজিতে (Consciousness)। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই হলো বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞান চায় প্রমাণ। যদিও যে অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি প্রচলিত বৌদ্ধ দর্শনে সে অর্থে বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। তথাপি বৌদ্ধ-দর্শনে অন্ধবিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। এ দর্শনে অপ্রমাণিত বিষয়ের কোনো স্থান নেই। এখানে অপরীক্ষিত বিষয়ের কোনো স্থান নেই। এ দর্শনে কল্পনার কোনো স্থান নেই। বৌদ্ধধর্ম-দর্শন একটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যা তৎমুহূর্তে প্রমাণ করা যায় (সন্দিট্ঠিকো) প্রত্যক্ষদৃষ্ট (প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ১)। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে দেখা যায় যে, বৌদ্ধ দর্শন হলো প্রত্যক্ষদৃষ্ট দর্শন। প্রতীত্য সমুৎপাদে যে বিজ্ঞান বা মনের উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে প্রতিসন্ধি চিত্ত। প্রতিসন্ধি চিত্তের কথা বলতে গেলে ভবাঙ্গ চিত্ত ও চ্যুতি চিত্তের কথাও বলতে হয়। নদীর উৎসের সঙ্গে নদীর ও তার মোহনার যে সম্পর্ক, প্রতিসন্ধির সঙ্গে ভবাঙ্গ ও চ্যুতির সম্পর্কও একই। নদীর প্রবাহে তার উৎস, মধ্যভাগ ও মোহনা যেমন সম্পর্কযুক্ত, তেমনি জীবন প্রবাহে প্রতিসন্ধি, ভবাঙ্গ ও চ্যুতি আদি, মধ্য, অবসানরূপে সম্পর্কিত। কালের অনন্ত বিস্তারে জীবের জীবত্বের লীলা চলে। অর্থাৎ, এমতাবস্থায় জন্ম-জন্মান্তর গ্রহণ চলতে থাকে। তখন সংস্কার রূপ কর্মবীজের অংকুরণে মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্তী নতুন জন্মলগ্নে যে চিত্তের উদয় হয়, তাকে বলা হয় প্রতিসন্ধি চিত্ত। মৃত্যু ও নবজন্মের সন্ধিক্ষণে দুই ভবের মধ্যে মিলন হেতু রচনা করে বলে প্রতিসন্ধি চিত্ত তার উৎস। প্রতিসন্ধি চিত্তের পরেই ভবাঙ্গ প্রবাহ বা ভবাঙ্গ চিত্ত যা চলতে থাকে আজীবন। একে মনের অবচেতন স্তর বলা যায়। মৃত্যুকালে যে চিত্ত একটি জন্মের ওপর যবনিকা টেনে চ্যুতি ঘটায় তাকে বলা হয় চ্যুতি চিত্ত। অতএব, একটি জন্মের কাল সীমার মধ্যে এ তিনটি চিত্ত যথাক্রমে আদি, মধ্য ও অবসান রূপে চিহ্নিত (শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ৯, ১০)। সংযোজন (বন্ধন) সমুহের বিষয়ীভূত ধর্মসমূহের প্রতি ক্ষতি উপলব্ধি করে বসবাস করতে পারলে বিজ্ঞানের সঞ্চার হয় না (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ২৫৪)। সংযোজন বা বন্ধন ছিন্ন করতে পারলে মানুষ নিজেকে বিশ্বে একজন আধ্যাত্মিক, মানবিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারে। একজন সত্যমনস্ক, আধ্যাত্মিক মানুষ বিশ্ববাসীকে আলোর পথ প্রদর্শন করতে পারে, দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করতে পারে।

১.৪ নাম-রূপ

নাম-রূপ এ মিশ্র শব্দকে কেবল নাম, কেবল রূপ এবং সংযুক্তরূপে নাম-রূপ হিসেবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। এখানে নাম বলতে তিন প্রকার স্কন্ধকে বোঝায়। সেগুলো হলো: বেদনা, সংজ্ঞা এবং সংস্কার। যা প্রতিসন্ধি চিত্তের সঙ্গে একমাত্র (সহজাত রূপ) উৎপন্ন হয় (সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া ৩১১)। কার্যকারণ প্রবাহে আমরা দেখতে পাই, বিজ্ঞানের উদয়ে নাম-রূপের উদয়। সহজ কথায় বলা যায় যে, নাম হচ্ছে সত্তার সূক্ষ্ম মানসিক অংশ, রূপ বলতে স্থূল বা ভৌতিক অংশকে বোঝায় অর্থাৎ কায় ও মন-এ দু'টির সমন্বয়ে জীব। জীবের ভৌতিক দেহের মধ্যে পড়ে রূপ এবং মানসিক দেহের মধ্যে পড়ে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার। এ দু'য়ে মিলে হয় নাম-রূপ। সংস্কার

হচ্ছে মনোবৃত্তিসমূহ। লোভ, দ্বেষ, মোহ, মান, ঈর্ষা, মাৎসর্য প্রভৃতি অকুশল বা পাপ মনোবৃত্তি এবং অলোভ, অদ্বেষ, শ্রদ্ধা, প্রীতি, করুণা ইত্যাদি কুশল বা পুণ্য মনোবৃত্তি। বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এ তিনটিকে একত্রে বলা হয় 'নাম'(মন)। বস্তুত 'নাম হচ্ছে চিত্ত বা মন এবং রূপ হচ্ছে ভৌতিক দেহ। উপর্যুক্ত কারণে ইন্দ্রিয়গোচর এবং তাদের গ্রাহ্য বিষয়সমূহ নাম-রূপের অন্তর্গত (ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বেলু রানী বড়ুয়া ও রানী বড়ুয়া ৮৯, ৯০)। তবে আমরা বস্তুতপক্ষে বা সাধারনতঃ যে অর্থে বিজ্ঞান কথাটি ব্যবহার করি, সে অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। 'বিজানাতীতি বিঞ্ঞানং চিন্তেতীতি চিত্তং' অর্থাৎ, জানা অর্থে বিজ্ঞান এবং চিন্তা করা অর্থে চিত্ত বলা হয়। এ অর্থ সংকীর্ণ, ব্যাপক নয়, তবে বিজ্ঞান এবং চিত্ত মনের প্রতিশব্দ। সুতরাং বিজ্ঞান বলতে মনকেই বোঝায়। মানসিক বৃত্তিসমূহ ব্যতীত মনের কোনো ব্যাপার সংঘটিত হতে পারে না। তাদের সম্মিলনেই তা সম্ভব হয়। এতে উভয়ের একই বস্তু বা আধার, একই আলম্বন বা বিষয়। অতএব, মন এবং মানসিক বৃত্তি সমূহ কোনোটি আগে এবং কোনোটি পরে না হয়ে একসঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে উৎপন্ন হয় এবং একই সঙ্গে ভেঙে যায়। মনোৎপত্তির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্পর্কে আচার্য বুদ্ধঘোষের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন: বুদ্ধ কঠিনতর কার্য করেছেন, যেহেতু তিনি একালম্বনে স্থিত চিত্ত চৈতসিক ধর্মসমূহের (মন ও মানসিক বৃত্তি সমূহের) প্রত্যেকটিকে পৃথক করে ভাষায় প্রকাশের উপযুক্ত অভিধা উদ্ভাবন প্রদর্শন করেছেন। এক্ষেত্রে রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের প্রশ্নোত্তর প্রণিধানযোগ্য। এ নাম ও রূপের একত্ব ও নানাত্ব সম্পর্কে রাজা মিলিন্দ ও ভদন্ত নাগসেনের প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ৪৭) নিম্নরূপ:

মিলিন্দ : কে জন্মগ্রহণ করে?

নাগসেন : নাম ও রূপ জন্মগ্রহণ করে।

মিলিন্দ : এই নাম-রূপই কি জন্মগ্রহণ করে?

নাগসেন : এই নাম-রূপই জন্মগ্রহণ করে না। মানুষ এই নামরূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্য কর্ম করে, সেই কর্ম দ্বারা অপর নাম-রূপ জন্মগ্রহণ করে।

মিলিন্দ : যদি এই নাম-রূপই জন্মগ্রহণ না করে, তবে সে পাপ কর্ম থেকে মুক্তিলাভ হবে কি?

নাগসেন : যদি পুনর্বার জন্মগ্রহণ না করে তবে পাপ কর্ম হতে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু যেহেতু সে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সে কারণে পাপ কর্ম হতে মুক্ত নয়।

মিলিন্দ : উপমা প্রদান করুন।

নাগসেন : যেমন কোনো ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির আম চুরি করে। আমের মালিক তাকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে যায় এবং বলে-দেব! এ ব্যক্তি আমার আম চুরি করেছে। তখন চোর বলে-দেব! আমি তার আম চুরি করিনি। তিনি এক আম রোপন করেছেন, আমি অন্য আম নিয়েছি। সুতরাং আমার শাস্তি হওয়া অনুচিত। এ ব্যক্তি দণ্ডনীয় হবে কি না?

মিলিন্দ : দণ্ডনীয় হবে।

নাগসেন : কেন? মিলিন্দ : যদিও সে এরূপই মানুষ এই নাম ও রূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে। সে কর্ম দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্যকর্ম করে। সে কর্ম দ্বারা অন্য নাম রূপ পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। এ কারণে সে আপন কর্ম হতে মুক্ত নয়।

মিলিন্দ : পুনরায় উপমা প্রদান করুন?

নাগসেন : যে কোনো ব্যক্তি অপর কারও ধান্য বা ইক্ষু চুরি করে এবং ধরে আনলে আম্রচোরের মতো বলে---। মহারাজ! যেমন কোনো ব্যক্তি শীতকালে অগ্নি জ্বেলে তাপ নিল এবং সেটা নিভিয়ে চলে গেল। তৎপর সেই অগ্নি অন্য লোকের ক্ষেত্র দগ্ধ করল। তখন ক্ষেত্রের মালিক তাকে ধরে রাজার নিকট নিয়ে আসে এবং বলে 'রাজন! এই ব্যক্তি আমার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করেছে।' সে এরূপ বলে-'দেব! আমি তার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিনি। আমি তার ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করিনি। আমি যা নির্বাপিত করিনি তা এক অগ্নি, আর যা ক্ষেত্র প্রজ্জ্বলিত করেছে সেটা অপর অগ্নি। সুতরাং আমি দণ্ডিত নই।" এখন মহারাজ! আপনি বলুন, তাকে শাস্তি দেয়া উচিত কিনা?"

মিলিন্দ : হ্যাঁ ভন্তে! শাস্তি হওয়া উচিত।"

নাগসেন : কেন?

মিলিন্দ : যদিও সে এরূপ বলে তবু ভন্তে! পূর্বের অগ্নি প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন থাকায় পরবর্তী অগ্নির জন্য সে দণ্ডিত হবে।

নাগসেন : "মহারাজ! এরূপ মানুষ এই নাম-রূপ দ্বারা পাপ কিংবা পুণ্য কর্ম করে----।

মিলিন্দ : আরও উপমা প্রদান করুন।

নাগসেন : মহারাজ! যেমন কোনো ব্যক্তি প্রদীপ নিয়ে স্বীয় প্রাসাদের ছাদে উঠে এবং সেখানে ভোজন করে। সেই প্রদীপ জ্বলতে জ্বলতে কোনো তৃণ দগ্ধ করল । তৃণ জ্বলতে জ্বলতে কোনো গৃহ দগ্ধ করল। গৃহ জ্বলে সমগ্র গ্রাম দগ্ধ করল। গ্রামবাসীরা সেই ব্যক্তিকে ধরে বলল 'তুমি কেন গ্রামে আগুন জ্বেলে দিলে? তখন সে বলল ' আমি গ্রামে আগুন জ্বেলে দিইনি, আমি যে আলোতে ভোজন করেছি সেই প্রদীপাগ্নি ছিল এক, আর যে অগ্নিতে গ্রাম জ্বলেছে তা অন্য'। মহারাজ! এ প্রকারে বিবাদমান উভয় পক্ষ আপনার নিকট উপস্থিত হলে আপনি কার পক্ষে রায় দিবেন?"

মিলিন্দ : ভন্তে! গ্রামবাসীর দিকে।"

নাগসেন: কেন?

মিলিন্দ: যদিও সে এরূপ বলে তবুও তা (প্রদীপাগ্নি) হতে এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছে।

নাগসেন: মহারাজ! এ প্রকারেই যদিও মরণের সময় এক নাম-রূপ বিনষ্ট হয় এবং জন্ম গ্রহণের সময় অন্য নাম-রূপ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পূর্ব নাম-রূপ হতে পরবর্তী নাম-রূপ উৎপন্ন হয়েছে। সে কারণে সে স্বীয় কর্ম হতে মুক্ত নয়।

উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের রোধ হলে নাম-রূপ ধ্বংস হয় (মহাস্থবির [বনভান্তে], ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে,পরবর্তী জন্মে যেহেতু কৃতকর্মের ফলভোগ করতে হয় । সেহেতু সাধ্য অনুযায়ী কুশল কর্ম সম্পাদন করা সমীচিন। মানব কল্যাণমূলক কর্মে ব্যাপৃত থেকে উচ্চতর সৎ গুনাবলী উৎকর্ষের মাধ্যমে মানুষের শান্তি, উন্নয়ন, কল্যাণের, দুঃখ মুক্তির জন্যে কাজ সম্পাদনে রত হওয়া উচিত। তবেই ইহ-পারলৌকিক শান্তি সুনিশ্চিত সম্ভব হবে।

১.৫ ষড়ায়তন

আয়তন বলতে বসতি বা স্থানকে বোঝায় (চট্টোপাধ্যায় ৮৯)। গৌতম বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থান কালে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে দেশনা করতে গিয়ে ষড়ায়তন সম্পর্কে বলেন: ষড়ায়তন (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন) ছয়টি দৈহিক অঙ্গের প্রত্যেকটিকে ভিত্তি করে এক একটি ক্ষেত্র বা আয়তনের সৃষ্টি হয় (ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ১০৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, নাম-রূপ বা চিত্ত দেহের বাহন। দেহ উৎপন্ন হলেই তার কাজ সম্পাদন করার জন্য ষড়ায়তন বা ষড়েন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। এ ষড়েন্দ্রিয়ের মধ্যে মন প্রধান। মনের সাহায্য ব্যতীত মানুষ অচল। দেহ-মন বিদ্যমান থাকলে ষড়ায়তন বিদ্যমান থাকবেই। মানুষ মনে-প্রাণে বা ষড়ায়তন দ্বারা আদর্শ, কল্যাণ কর্ম সম্পাদন করলে সমাজে কোনো প্রকার অশান্তি বিরাজ করবে না।

১.৬ স্পর্শ

পালিতে 'ফস্‌স' যা বাংলায় হলো স্পর্শ। ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ। বিশিষ্ট অর্থকথাকার বুদ্ধঘোষের মতে, সংযোগ বা মিলনকে স্পর্শ বলে। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্পর্শকরণ। এর কাজ হচ্ছে কোনো ব্যক্তিকে বাহ্যিক কোনো বিষয়ের সংস্পর্শে আনা। এর ফল হচ্ছে একত্রে আনা। যে বস্তুটি এর পথে আসে তা স্পর্শ ঘটায়। যেটি আকার বিহীন কোনো একটা বস্তুর সাথে লেগে থেকে এটা অবস্থান করে স্পর্শ এবং এর বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে চক্ষু ও রূপের সাথে, কর্ণ ও শব্দ, মন ও চিন্তন, বস্তুর সাথে সম্পর্কের ন্যায়। সংস্কার সমূহের একটি হলো স্পর্শ। স্পর্শ ছাড়া সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব হয় না। চক্ষু আছে বলেই সবকিছু দৃশ্যপটে আসে নতুবা সবাই অন্ধ। কর্ণ আছে বলেই শুনতে পায় (M. R. Davids , IV-VI)| ছয় আয়তনের সংশ্রবে আসলেই স্পর্শ সংঘঠিত হয়ে থাকে। আবার স্পর্শও ছয় প্রকার। সেগুলো হলো: ১. চক্ষু সংস্পর্শ। ২. শ্রোত্র সংস্পর্শ। ৩. ঘ্রাণ সংস্পর্শ। ৪. জিহ্বা সংস্পর্শ। ৫. কায়সংস্পর্শ। ৬. মনসংস্পর্শ (প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া ১০২)। এ স্পর্শ থেকে আনন্দ, অপ্রীতি-ধ্বংস ও উৎপত্তিরূপ, সংস্কার উৎপন্ন হয়। স্পর্শের কারণ নাম ও রূপ, রূপের নাশে স্পর্শ বিনাশ হয়। স্কন্ধ সমুহের বিনাশ সাধনই শ্রেষ্ঠ বস্তু (সাধনানন্দ মহাস্থবির [বনভান্তে], ভূমিকা)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, স্পর্শজনিত সুখের জন্যে বিশ্বব্যাপী অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হচ্ছে। সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে নানা প্রকার অস্থিরতা। স্পর্শ সুখ ত্যাগ করতে পারলে সকল প্রকার সামাজিক অশান্তি হ্রাস পেতে পারে।

১.৭ বেদনা

'ফস্‌স পচ্চযা বেদনা' স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনার উৎপত্তি হয়। অনুভূতি বা বিশেষ অবস্থা এবং সংবেদন হচ্ছে বেদনার লক্ষণ। দ্বার হিসেবে বেদনা ছয় প্রকার। সেগুলো হলো- ১.চক্ষু সংস্পর্শজা বেদনা। ২.শ্রোত্র সংস্পর্শজা বেদনা। ৩.ঘ্রাণ সংস্পর্শজা বেদনা। ৪.জিহ্বা সংস্পর্শজা বেদনা। ৫.কায় সংস্পর্শজা বেদনা এবং ৬.মন সংস্পর্শজা বেদনা (M.R.Davids 136)। একথা স্পষ্ট, স্পর্শের কারণে বেদনার সৃষ্টি। যা স্পর্শ ব্যতীত জাগে না। এ কারণে বলা হয়েছে: স্পর্শের কারণে বেদনা। কোনো ব্যক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। সে সেখানে দিব্য পঞ্চকাম সুখ উপভোগ করে। তার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়' আমি পূর্বে পুণ্যকর্ম করেছি। সে কারণেই আমি এরপ সুখ ভোগ করছি। এরপ অনুভব ও সংবেদন বেদনার লক্ষণ (পণ্ডিত ধর্মাধার (মহাস্থবির ৬৪)। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, একজন পুণ্যকৃত, আলোকিত, মানবিক ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে নিজে সুখ অনুভব করে এবং ইহলোকে অন্যের শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কাজ হতে বিরত থাকেন। ফলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করে।

১.৮ তৃষ্ণা

'বেদনা পচ্চযা তণ্হা'- বেদনার প্রত্যয়ে তণ্হা বা তৃষ্ণার উৎপত্তি হয়। তৃষ্ণা বলতে আসক্তি, আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে বোঝায়। তৃষ্ণার বশীভূত হয়ে মানুষ সুখের হোক, দুঃখের হোক কার্য সম্পাদন করে। এ তৃষ্ণা ছয় প্রকার। যথা- ১.চক্ষু তৃষ্ণা, ২. শ্রোত্র তৃষ্ণা, ৩. ঘ্রাণ তৃষ্ণা, ৪.জিহ্বা তৃষ্ণা, ৫.কায় তৃষ্ণা এবং ৬.মন তৃষ্ণা। প্রবর্তন আকারের তৃষ্ণা তিন (০৩) প্রকার। কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা, বিভব তৃষ্ণা। সর্বদিকে এই তৃষ্ণালোকের প্রবাহ। স্মৃতি এর নিবারক। প্রজ্ঞা তার গতি রূদ্ধকারক (সাধনানন্দ মহাস্থবির [বনভান্তে ভূমিকা)। এ তৃষ্ণা বা অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা, আসক্তির কারণে সমাজে মানুষের মাঝে লোভ, হিংসা, মোহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোর প্রভাবে নানা প্রকার অন্যায়, অনাচার, অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। মানবতা চরম অপমানিত হচ্ছে। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, তৃষ্ণা ধ্বংস করতে পারলে সর্ব প্রকার অশান্তি, অরাজকতা, অমানবিকতা লোপ পেতে পারে। তৃষ্ণার নিরোধ করা গেলে দুঃখ থেকে মুক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে।

১.৯ উপাদান

'তণ্হা পচ্চযা উপাদান'- তৃষ্ণার কারণে উপাদান হয়। তৃষ্ণা যখন প্রবল হয়, তখন তা উপাদনে পরিণত হয়। সংরক্ষণ এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করে বলে উপাদান। এ উপাদান চার প্রকার। যথা- ১.কাম উপাদান(ইন্দ্রিয় সম্ভোগ)। ২.দৃষ্টি উপাদান(মিথ্যা ধারণা)। ৩.শীলব্রত উপাদান (আচার-অনুষ্ঠানই সঠিক পথ) এবং ৪.আত্মবাদ উপাদান (শাশ্বত আত্মায় বিশ্বাসী)। (Yanatilak 154)। লোভের ভিতর দিয়েই হোক, দ্বেষের ভিতর দিয়েই হোক উপাদানের দৃঢ়বন্ধন জীবকে ভবের সঙ্গে বেঁধে রাখে (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ১৬)। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, একজন প্রকৃত সাধক যখন লোভ, দ্বেষ বা চার প্রকার উপাদান ধ্বংস করতে পারে তখন সে আত্মকল্যাণ ও পরকল্যাণে ব্রতী হতে পারে। এ প্রেক্ষিতে তাঁর দ্বারা সমাজে কোনো প্রকার অন্যায় কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয় না। এরূপ ব্যক্তি বিশ্বশান্তি ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকেন।

১.১০ ভব

√'ভূ' ধাতু থেকে 'ভব' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। ভব শব্দের অর্থ হলো 'হওয়া'। হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় কর্ম সম্পাদিত হয় এবং উৎপন্ন হয় বলে ভব। সাধারণতঃ ভব বলতে বোঝায় জন্ম, সংসারকে (শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ১৭)। ভব প্রধানতঃ দুই প্রকার। যথা- ১.কর্ম ভব এবং ২.উৎপত্তি ভব। কর্মভব স্বভাবত ক্রিয়াশীল। উৎপত্তি ভব জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। পূর্বে উল্লেখিত পুণ্যাভি সংস্কার, অপুণ্যাভি সংস্কার এবং আনেঞ্জাভি সংস্কার মূলত কর্ম নামে অভিহিত। ভবগামী সমস্ত সংস্কারই কর্মভব। উৎপত্তি ভব হলো কর্মোৎপন্ন স্কন্ধ। পূর্ববর্তী জন্ম থেকে পরবর্তী জন্মসমূহের কর্মফল রূপ সংযোগ সৃষ্টি করে কর্মভব এবং উৎপত্তি ভব। উপাদানকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। রূপভূমি এবং অরূপভূমি। এ দুইটি উৎপত্তি ভবের কারণ এবং কামভূমির কারণ হলো কুশলকর্ম এবং বিপাক উপনিশ্রয় দ্বারা উৎপত্তিজাত। কাম ভবে উৎপত্তির কারণ অকুশল কর্মভবের সহজাত, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত এবং হেতু প্রত্যয় (M. R. Devids 137) । গৌতম বুদ্ধের মতে, ভব রুদ্ধ হলে পুনর্জন্ম নিরোধ হয়। উপাদান নিরোধের দ্বারা জন্ম নিরোধ হয়।(ড. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী, ১৯৯৯: ৪০১) এটা জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, কারণ পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভ দুঃখ। জন্ম রোধে সচেষ্ট ব্যক্তি কোনো প্রকার শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকেন। কারণ মূল

উদ্দেশ্য হলো জন্ম-মৃত্যু রোধ করে শাশ্বত সুখ অনুভব করা। ফলে তিনি সর্বদা মঙ্গলময় কর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

১.১১ জাতিঃ

'ভব পচ্চযা জাতি'- ভবের প্রত্যয় জাতি বা জন্ম। জন্ম বলতে প্রতিসন্ধিক্ষণে পঞ্চস্কন্ধের (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) মাতৃজঠরে উৎপত্তিকে জাতি বা জন্ম বলে (Yanatilok 155)। কর্মভবই প্রতিসন্ধি বা উৎপত্তির হেতু। নদীর স্রোতের ন্যায় এ গতি প্রবাহমান চলতে থাকে। এ প্রবাহ কার্যকারণ নির্ভর। পুনর্জন্ম বলতে কোনো সত্ত্বে সঞ্চিত কর্মের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল কর্ম ভবের প্রত্যয়কেই জন্ম বলে। যা কুশল বা অকুশলও হতে পারে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক কর্মের মধ্যে এবং উপনিশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, জন্মরোধ করার প্রত্যয়ে সকল প্রকার অমানবিকতা, অশান্তি, অকুশল কর্ম বর্জন করে সৎ, মঙ্গলময় কর্ম করলে বিশ্বশান্তি সহজ হতে পারে।

১.১২ জরা-মরণঃ

'জাতি পচ্চযা জরামরণং'-স জাতি বা জন্ম থেকেই জরা সম্পাদিত হয়। জন্ম হলেই জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, শোক, পরিতাপ, দুর্মনতা, হতাশা, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ পোহাতে হয় (T. W. R. Devids 160)। জন্ম না হলে উপরোল্লিখিত দুঃখ যন্ত্রণার ভোগ করতে হয় না। এরূপে জন্মকে উপনিশ্রয় করেই জরা-মরণ প্রভৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয় হয়। বৌদ্ধ দর্শনে তিনবৃত্ত বা চক্রের উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো হলো: ১. ক্লেশবৃত্ত: অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও উপাদান হলো ক্লেশবৃত্ত। ২. কর্মবৃত্ত: সংস্কার ও কর্মভবকে বলে কর্মবৃত্ত এবং ৩. বিপাকবৃত্ত: বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ ও বেদনা। এ পঞ্চাঙ্গ উৎপত্তি ভব বিপাকবৃত্ত নামে অভিহিত। এই ত্রিবৃত্ত চক্রাকারে পরস্পরের উপনিশ্রয়রূপে কাজ করে। এর দ্বিমূল, ত্রিকাল, ত্রিসন্ধি এবং চার সংক্ষেপ বশে বিভাজন করা যায় (ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া ৭১)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, অবিদ্যাই সকল প্রকার দুঃখ, অশান্তির অন্যতম কারণ। এ অবিদ্যাকে ধ্বংস করা গেলে পুনর্জন্ম রোধ করে সকল প্রকার দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব হবে। রাজকুমার সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমণে বের হয়ে জরাগ্রস্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃতদেহ, সন্ন্যাসীর জাগতিক পরিণতির মর্ম বুঝে জীবনের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রয়াসেই তিনি মুক্তির পথে অভিযাত্রা করেছিলেন। মানবজীবনে সুখের চেয়ে দুঃখের পরিমাণই বেশি। মানুষের অপরিসীম দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্ট অনুধাবন করেই সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করেছিলেন। তিনি এ দুঃখের মূল কারণ হিসেবে মানুষের অজ্ঞানতাকেই চিহ্নিত করেছিলেন। তাই বৌদ্ধ দর্শনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করা। অবিদ্যাকে দূর করে প্রতীত্যসমুৎপাবোধ জাগ্রত করতে পারলে বৈষয়িক চিন্তা-চেতনার কুফল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয় (জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া ৯৩, ৯৯)। বৌদ্ধ মতানুযায়ী মানুষের দুঃখভোগের প্রধান কারণ অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা। দুঃখের মূল কারণ হলো অনাত্মবাদ, অনিত্যবাদ, আর্যসত্য চতুষ্টয়সত্য প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাব। এগুলো সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অভাবে জন্ম নেয় অহংবোধ। এ জগৎকে অপরিবর্তনীয় মনে করার কারণে জাগতিক বস্তুর প্রতি জন্ম নেয় আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি। বৌদ্ধধর্ম-দর্শনে এর যে সমাধান দেওয়া হয়েছে তা মূলত মনস্তাত্ত্বিক। মানুষ যখন সম্যক জ্ঞানের মাধ্যমে তার আমিত্ববোধকে এবং জাগতিক বস্তুকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে অর্জন করার ও ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহা বিনষ্ট করতে পারে, তার মধ্যে তখন আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন-সে রূপান্তরিত হয় এক আলোকপ্রাপ্ত অন্য মানুষে। অবিদ্যা পরিহার করলে ব্যক্তি মানুষ তখন পরিবর্তিত হবে এক নতুন মানুষে,পরিপূর্ণভাবে বিকশিত এক মানবিক মানুষে। পৃথিবীর মানুষ আজ সংগ্রাম করছে রোগ-শোক, দুঃখ-

দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার-এর বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রযুদ্ধ সন্ত্রাসমুক্ত এক সুন্দর পৃথিবীর জন্য (চাকমা ১০৩-১০৬, ১০৮-১০৯)। উপর্যুক্ত আলোচনা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, কল্যাণকর, নিষ্পাপ জীবন গঠনে এ কার্যকারণবোধের শিক্ষা অতীব গুরুত্ববহ নিঃসন্দেহে বলা যায়। উপর্যুক্ত কারণে বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের ক্লেশ, অশান্তি, স্বার্থপরতা, জড়তা, আত্মকেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে কার্যকারণনীতিবোধের অভাব। প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান তথা আত্মজিজ্ঞাসাই এনে দিতে পারে আত্মশুদ্ধিতা। এ প্রতীত্যসমুৎপাদবোধই দিতে পারে দুঃখ হতে পরিত্রাণ। লাভ হতে পারে পরম সুখ নির্বাণ। এ বিশ্বের সব কিছুই ক্ষুদ্র-বৃহৎ, স্থূল-সুক্ষ্ম, সব ঘটনা প্রবাহই কারণ সম্ভূত। সুতরাং বিশ্ববৈচিত্র্য কারণ সম্ভূত। তখন সে কারণের নিরোধ, সে কারণ সম্ভূত ও তৎসম্পর্কিত দুঃখরাশিও ধ্বংস হয়ে যায়। দুঃখের এ উৎপত্তি-বিনাশ প্রদর্শনই প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতির মূল উদ্দেশ্য। উপর্যুক্ত আলোচনা পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সকল বন্ধন, দুঃখ থেকে পরিত্রাণে ভূমিকা রাখতে পারে এ কার্য-কারণনীতিবোধ। সৎ, আলোকিত, মানবিক ও আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য এবং নির্বাণ অর্জনের ক্ষেত্রে বৌদ্ধ কার্যকারণতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। উপর্যুক্ত কারণে বৌদ্ধ দর্শনে কার্যকারণতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের উপযোগিতা

এ প্রবন্ধটি জ্ঞানের জগতে অনন্য ভূমিকা রাখতে পারে। কার্যকারণনীতিতত্ত্ব দর্শন জগতে বুদ্ধের একটি অবিস্মরণীয় ও বিস্ময়কর আবিষ্কার। বৌদ্ধ দর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রতীত্যসমুপাদতত্ত্ব সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি অর্জন করতে হবে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্মে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব একটি জটিল বিষয়। প্রতীত্যসমুৎপাদ কি, প্রতীত্যসমুৎপাদের শ্রেণীবিন্যাস, প্রাত্যহিক জীবনে এ প্রতীত্যসমুপাদতত্ত্ব উপলব্ধির গুরুত্ব কতটুকু, দুঃখ নিবৃত্তি সাধনে এর প্রতিফলন কিভাবে করতে হয়, এর প্রক্রিয়া কী, বৌদ্ধ কার্য-কারণতত্ত্বের স্বরূপ কী ও এর প্রাসঙ্গিকতা, দুঃখ থেকে মুক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিপিটকে বর্ণিত এবং বিভিন্ন পন্ডিত, গবেষক, বৌদ্ধ তত্ত্ববিদ্দের আলোচনার সূত্রকে ভিত্তি করে আলোচ্য প্রবন্ধে প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের দর্শন সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রতীত্যসমুৎপাদ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা খুবই প্রয়োজন। কারণ প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব হলো বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম দার্শনিক উপাদান। বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত কার্যকারণনীতিতত্ত্বের সাথে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনের সম্পর্ক খোঁজে পাওয়া যায়। মানব জীবন দুঃখের সাগর। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই মানুষের সকল প্রকার অশান্তি ও দুঃখের মূল কারণ। অবিদ্যার কারণে হিংসা, বিদ্বেষ, অমানবিকতা, অশান্তির সৃষ্টি হয়। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে সর্বপ্রকার দুঃখ, অশান্তি থেকে মুক্তির লক্ষ্যে কার্যকারণতত্ত্ব উপলব্ধির জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। মানুষের মানবীয় গুণাবলির বিকাশ, সুখ-সমৃদ্ধি, দুঃখ মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতীত্যসমুৎপাদবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এ প্রবন্ধটির দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্তি প্রয়াসী সাধকগণ উপকৃত হতে পারেন।

উপসংহার

বুদ্ধ ছিলেন একজন মানবতাবাদের মূর্ত প্রতীক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শান্তির দর্শন, জ্ঞানের দর্শন। তিনি ছিলেন কার্যকারণতত্ত্ব ও নির্বাণের উদ্ভাবক। বৌদ্ধধর্মের চরম লক্ষ্য নির্বাণ। কার্যকারণ সূত্র তথা জাগতিক ঘটনা উপলব্ধি করতে না পারলে কখনও দুঃখমুক্তি বা নির্বাণ লাভ সম্ভব হবে না। বুদ্ধের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিলো সাম্য, শান্তি, মানবতা। এগুলো মনন, ধারণ, অনুশীলন করলেই দুর্লভ মানবজীবন সার্থক হবে। দুর্লভ মানবজীবনকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্যে কার্যকারণ নীতি অনুধাবন করে সৎ পথে চলা যায়। তাই প্রত্যেকের সত্যসন্ধানী

হওয়া সমীচীন। সত্য সন্ধান করার জন্য নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। সিদ্ধার্থ সত্য সন্ধান করেছেন নিজের মধ্যে। তিনি সত্যকে খোঁজ করতে গিয়ে দ্বাদশ নিদানের সন্ধান লাভ করেন। কার্যকারণ নীতি বুদ্ধের সাধনার ফল। এটি অকাট্য সত্য। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব হৃদযঙ্গম করতে পারলে সকল প্রকার বন্ধন ছিন্ন করা সম্ভব হবে। এতে দুঃখ থেকে নিবৃত্তি অর্জন করা যায়। উপর্যুক্ত কারণে পরম সুখ নির্বাণ লাভও সম্ভব হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

[১] *যদা হবে পাতুভবন্তি ধম্মা*
আতাপিনো ঝাযতো ব্রাহ্মণস্স,
অথস্স কঙ্খা বপযন্তি সব্বা
যতো পজানাতি সহেতু ধম্মন্তি (শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির এবং শ্রীমৎ জ্যোতি:পাল ভিক্ষু, অনূদিত [খুদ্দক নিকায়] *উদানং*, রেঙ্গুন, প্রথম প্রকাশ, ২৪৭৪ বুদ্ধাব্দ, ১৯৩০, বোধিবগ্গো, পঠমো, বোধিসূত্তং, ৩)।

প্রাথমিক উৎস:

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া (অনূদিত)। *অঙ্গুত্তর নিকায় ৪র্থ খণ্ড*, ।প্রজ্ঞা ও শিলাস্তম্ভ। বনভান্তে প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫।

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু (অনূদিত)। *অঙ্গুত্তর নিকায়*, *৫ম খণ্ড [দশম-একাদশ নিপাত]* যমক বর্গ, অবিদ্যা সূত্র। রাজবন বিহার, ২য় প্রকাশকাল, ২০১৫ ।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনূদিত)। *ধর্মপদ [মূল ও বঙ্গানুবাদ]*,শ্লোক নং-৩৩৩। বুদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৫৪।

ভিক্ষু শীলভদ্র (অনূদিত)। *দীর্ঘ নিকায়*, অগ্গঞ্ঞ সুত্র। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪৭ ।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো (অনূদিত)। *বুদ্ধবাণী সংকলন- সংযুক্ত নিকায় [১ম ও ২য় খণ্ড]*, বুদ্ধবর্গ। ২০১৬।

রাজগুরু শ্রীমৎ ধর্মরত্ন মহাথের, ভিক্ষু শীলভদ্র (অনুদিত)। *দীর্ঘ নিকায় [অখণ্ড]*, ব্রহ্মজাল সূত্র। ২০১৫ ।

শ্রীমৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় ভিক্ষু (অনূদিত)। *অভিধর্ম পিটকে বিভঙ্গ*, পরিবেশনায়–শ্মশানভূমি ধর্মচর্চা কেন্দ্র।

শ্রী বেনীমাধব বড়ুয়া (অনূদিত)। *মধ্যম নিকায়*, *মূল পঞ্চাশ সূত্র*, আর্য্যপর্য্যেষণ সূত্র। ১৯৪০।

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির (অনূদিত) *মধ্যম নিকায়*, *দ্বিতীয় ভাগ*, ক্ষুদ্র সকুলোদায়ী সূত্র। রাজেন্দ্র সিরিজ-১, ১৯৫৬।

শ্রীমৎ জ্যোতিঃপাল স্থবির (অনূদিত)। *পুগ্গল পঞ্ঞত্তি (মানব চরিত্রের স্বরূপ)*। The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation.

শ্রী বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী (অনূদিত)। *মধ্যম নিকায় [তৃতীয় খণ্ড]*, বহুধাতুক সূত্র (১৫৫)। ২০০৬।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী (অনূদিত)। *সংযুক্ত নিকায় [১ম খণ্ড*, *২য় খণ্ড]*, বিজ্ঞান সুত্র। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ২০০৯।

সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে) অনূদিত, *সুত্তনিপাত*, ভূমিকা। ১৯৮৭।

দ্বৈতয়িক উৎস:

অধ্যাপক রনধীর বড়ুয়া। *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। ১৯৮৪।

অধ্যাপক ড. নীরু কুমার চাকমা। *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন।* অবসর প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ ২০০৭।

ডা: রামদাশ সেন। *বুদ্ধদেব, তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি*। করুণা প্রকাশনী, ১৯৯৭।

ড. সুকোমল চৌধুরী। *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।

ড.বহ্নি কুমারী ভট্টাচার্য। *'প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি'* [প্রবন্ধ] সম্যক। ১০বর্ষ, প্রবারণা পূর্ণিমা সংখ্যা, ২৫৪৯ বুদ্ধাব্দ।

ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া। *পালি সাহিত্যর ইতিহাস [প্রথম খণ্ড]*। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, আগষ্ট ১৯৮০।

ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, ড. বেলু রানী বড়ুয়া। বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব। পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ফেব্রেুয়ারি ২০১০।

ড.জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়। *ত্রিপিটক সমগ্র*। মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১১-১২।

ড. জয়দেব গঙ্গোপাধ্যায় শাস্ত্রী। *ললিতবিস্তর [ভগবান বুদ্ধের জীবন ও চরিত্র]*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৯।

জিতেন্দ্রলাল বড়ুয়া। বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাম, ২০০১।

রেবতপ্রিয় বড়ুয়া। *বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব*। বাংলা একাডেমী। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩।

দেবব্রত দাশ। ভারতীয় দর্শন। হুগলী মহসীন কলেজ, ১৯৮৫।

ধর্মানন্দ কোসম্বী রচিত, চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য (অনূদিত)। *ভগবান বুদ্ধ*, সাহিত্য একাডেমী, সপ্তম মুদ্রণ, ২০১৫।

প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত। *ভারতীয় দর্শন*, প্রথম খণ্ড। ব্যানার্জী পাবলিশার্স, পরিমার্জিত সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২ ।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (অনূদিত)। *মিলিন্দ প্রশ্ন*। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫।

প্রদীপ কুমার বড়ুয়া। *বৌদ্ধধর্ম-বিজ্ঞান-মনবিজ্ঞান-মনচিকিৎসা-অনুদর্শন*। জনপ্রিয় পুস্তকালয়, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া (অনূদিত)। *বুদ্ধঘোষ, জীবন ও কর্ম*। '১৬।

বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী। *প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি*, পূর্বাভাস। চট্টগ্রাম। ১৯৩৯।

ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী।। *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন*। ২য় সংস্করণ, ২০১২।

রঞ্জন বড়ুয়া। *অভিধর্ম সংগ্রহ [বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান]*। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯১।

শ্রী জ্যোতি:পাল মহাথের। *চর্যাপদ*, চর্যা-৯। দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০৫।

শ্রী বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি (সংকলিত)। *প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি*। ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ।

শ্রী মহিমচন্দ্র বড়ুয়া (অনূদিত)। *বিমুক্তি মার্গ*। ১৯৮৮।

শ্রী শান্তিকুসুম দাশগুপ্ত। *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ*। মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮।

শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। *অভিধর্ম-দর্পন [বৌদ্ধ দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আলোচনা]*। মহাযোগী জ্ঞানীশ্বর ট্রাস্টি বোর্ড, উত্তর ২৪ পরগনা, অখণ্ড সংস্করণ, ১৩৯৮।

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য (অনূদিত)। ভারতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতন। ১০ বি কলেজ রোড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০২০, দ্বিতীয় মূদ্রন, অক্টোবর ২০২১।

সোলয়মান আলী সরকার। *ভারতীয় দর্শন পরিচিতি*। বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০২।

সুদর্শন বড়ুয়া। *ত্রিপিটক-সংক্ষিপ্তাকার*। প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯।

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া। *অভিধমার্থ সংগ্রহ [বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞান]*। ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ১৯১৯।

হিরন্ময় বন্দোপাধ্যায়। *যত মত তত পথ*। শশধর প্রকাশনী, ১৯৮৭।

ইংরেজি:

Davids, Mrs. Rhys, [Ed] *Vibhanga*, London: P.T.S.1904.

Davids, Mrs. Rhys, *A Buddhist Manual of psychological Ethics*.

Devids, T.W.Rhys. *Buddhism*, London, 1896.

Vikkhu, Subhadra, *The message of Buddhism* [Ed.], By J.E. Ellan, Kegan paul, London, 1926.

Yanatilak, *Guide through the Abhidhamma pitaka*, The sosiedor News Paper, Ceylon Ltd. Lek House, Colombo, 1938.